কল্পনা : ছবিতে, কবিতায়

মৃণাল ঘোষ

-এক-

ভাবনা বনাম কল্পনা

কল্পনা মানবসত্তার অন্তর্লোকের এক বিমূর্ত অভিব্যক্তি। দেকার্ত বলেছিলেন ভাবনাতেই মানুষের সত্তার পরিচয়। একে একটু প্রসারিত করে বলা যায় 'আই ইমাজিন দেয়ারফোর আই অ্যাম।' মানবেতর অন্য প্রাণী কল্পনা করতে পারে না। কল্পনাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। এত দিনে মানবসত্তা যতটা এগিয়েছে, আত্মবিকাশ বা আত্মবিনাশের যত রকম উপকরণ জড়ো করেছে, এর সবেরই মূলে রয়েছে কল্পনা।

দেকার্তের সূত্রটিতে ভাবনার প্রসঙ্গ ছিল, কল্পনার নয়। তবে ভাবনার সঙ্গে কল্পনার নিবিড় সম্পর্ক আছে। ভাবনা ছাড়া কল্পনা সম্ভব নয়। ভাবনা কাকে বলে বা ভাবনার বৈশিষ্ট্য কী, এটা আমাদের আগে বুঝে নিতে হয়। অরিন্দম চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে, যার শিরোনাম 'ভাবনা কাহারে বলে?' তাঁর 'মননের মধু' গ্রন্থভুক্ত এই প্রবন্ধটির অনুসরণেই আমরা ভাবনা-র বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করব। প্রবন্ধের শেষে অরিন্দম ভাবনা-সংক্রান্ত পাঁচটি সূত্র দিয়েছেন। প্রথম দুটি সূত্র হল '১. ভাবা একটি স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া, যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও সুখদুঃখানুভব থেকে আলাদা। ২. স্মৃতির সাহায্য ছাড়া ভাবনা সম্ভব নয়, কিন্তু স্মরণই ভাবনা নয়।' প্রশ্ন হচ্ছে মানব-সত্তায় বা মানব-শরীরে ভাবনার চালক বা নিয়ন্ত্রক কে? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই শরীরের সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়ার মতো মস্তিষ্কই ভাবনারও নিয়ন্ত্রক। মস্তিষ্কের ভিতর যে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, তা যেমন শরীরের অন্তর্নিহিত ও বহিঃপ্রকাশিত সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়ার মূল উৎস, তেমনি ভাবনারও।

মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত 'ইমেজ' বা 'রূপকল্প' উৎসারিত করে। চেতন অবস্থাতেও করে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও করে। ঘুমন্ত অবস্থায় যখন 'ইমেজ' উৎসারিত হয়, তখন তাকে আমরা স্বপ্ন বলি। স্বপ্নের উপর চেতনমনের বা সত্তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই স্বপ্ন ভাবনা নয়, কল্পনা তো নয়ই। জাগরিত অবস্থায়ও মস্তিষ্ক থেকে 'ইমেজ' উৎসারিত হয়, সেগুলি স্বপ্নের মতো নিয়ন্ত্রণহীন না হলেও, অনেক সময়ই এলোমেলো হয়ে থাকে। সেগুলিও ভাবনা নয়। ভাবনার জন্য সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। কেননা মস্তিষ্ক যে এলোমেলো রূপকল্প নির্গত করে, তা গঠনমূলক ভাবনায় অনেক সময়ই বাধার সৃষ্টি করে।

এজন্য আমাদের গীতায় ভাবনা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যোগযুক্ত না হলে ভাবনা হয়

না, আর ভাবনা যার নেই তার শান্তি নেই। আর যে শান্তি নয় তার সুখ কোথা থেকে হবে?' অর্থাৎ মনকে সংযত না করতে পারলে, অনিয়ন্ত্রিত প্রতিমা-উৎসারণ বন্ধ না করতে পারলে, প্রকৃত ভাবনা কার্যকরী হয় না। এজন্য তন্ময় ভাবনা খুব কঠিন কাজ। মনের উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এজন্য। এই নিয়ন্ত্রণের প্রধানতম এক উপায় গভীরতর দায়বোধ বা ভালবাসা। গীতার এই উল্লেখকে বিশ্লেষণ করে মধুসূদন সরস্বতী ভাবনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে 'বিজাতীয় প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারা যা বাধ্যপ্রাপ্ত নয় তেমন নিরন্তর সজ্জাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহরূপী নিদিধ্যাসনকেই ভাবনা বলা হয়েছে' কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'বিজাতীয় প্রত্যয় বা জ্ঞান' ভাবনার একাভিমুখী প্রবাহকেসব সময়ই বাধা দেয়। সৃজনশীল ভাবনার মধ্যে এলোমেলো ভাবনা ঢুকে পড়ে মূল ভাবনাকে বিস্রস্ত করে।

তবে অনেক সময় দেখা যায় কোনো মন যদি সৃজনশীল বিষয়ের চর্চায় দীর্ঘদিন নিমগ্ন থাকে, তাহলে তার আপাত-অনিয়ন্ত্রিত ভাবনার মধ্যেও অনেকটা সৃজনময় শৃঙ্খলা তৈরি হয়। সেই শৃঙ্খলা-সঞ্জাত তাঁর যে আপাত-অনিয়ন্ত্রিত ভাবনা, তা তখন তাঁর সৃজনকে বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ করে তোলে। অনেক সুরিয়ালিস্ট কবিতা বা ছবি এই পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তুলে আনতে পারি পরিচিত একটি কবিতা। কবি উৎপল কুমার বসু। 'টুসু আমার চিন্তামণি' কাব্যগ্রন্থের (১৯৯৯) ১৮ সংখ্যক কবিতাটি একরম :

'ঘুম আর মোমিনপুরের মাঝামাঝি একটুকরো বারান্দা রয়েছে।
দুধ আর চা-পাতা রয়েছে— কেউ কেটলিটা বসিয়ে দেবে কি?
ফুটন্ত জলের শব্দে উঠে পড়ব— মানুষজনের গানে—
কাগজের নৌকাগুলি এইদিকে ভেসে আসছে।
কোনো এক বিখ্যাত লোকের মৃত্যুদিন আজ।'

আপাতভাবে বাকপ্রতিমাগুলিকে অসংলগ্ন মনে হতে পারে। এরকম হয় অনেকসময় কবির মনে এই শব্দগুলো পর পর এভাবেই এসে গেছে। তিনি লিখে গেছেন হয়তো কোনো রকম সম্পাদনা ব্যতিরিকেই। তবু এই আপাত-অসংলগ্নতার ভিতর থেকেই এই শব্দমালা গভীরতর এক অর্থে অর্থান্বিত হয়ে গেছে এবং কবিতা হয়ে উঠেছে। আপাত-অসংলগ্ন ভাবনাই 'কল্পনা'র দ্যোতনা পেয়েছে।

ছবিতেও এরকম ঘটতে পারে। ধরা যাক গণেশ পাইনের ১৯৭৫-এ আঁকা 'বসন্ত' ছবিটি। একটি বৃক্ষ মানবী হয়ে উঠেছে। গাছের ডাল হয়ে উঠেছে তার বাহু। ফলদুটি হয়ে উঠেছে তার স্তন। সম্মুখভাগে একটি পশুর করোটি অন্ধকারে ভেসে আসছে একটি জলযানের মতন। প্রান্তবর্তী পরিসরে একটি মশাল জ্বলছে, যেন ঋজু কোনো অস্থির উপর জ্বলছে দীপশিখা। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন একটি তরবারির আদল পাচ্ছে। এখানে অনেকগুলি প্রতিমা সংগঠনেই মগ্নচেতনার ভূমিকা আছে, যা হয়েতো সচেতন ভাবনা-নিরপেক্ষ। মগ্নচেতনা থেকে উঠে আসা অনিয়ন্ত্রিত ভাবনা এভাবে 'কল্পনা'-র

সাযুজ্য পেতে পারে।

নিয়ন্ত্রিতই হোক আর অনিয়ন্ত্রিতই হোক সব ভাবনারই ভাষা থাকে। ভাষাই ধারণ করে আমাদের ভাবনাকে। অরিন্দম বলেছেন 'ভারতীয় বৈয়াকরণ দর্শনের মহাগুরু ভর্তৃহরির ভাষায়... ভাবনা হল শব্দখচিত বপু'। অর্থাৎ ভাবনার একটা শরীর আছে। আর সেই শরীর শব্দখচিত। 'শব্দখচিত' বলে কবির খুব সুবিধে। তিনি শব্দগুলিকে সরাসরি বসিয়ে যেতে পারেন তাঁর কবিতায়। সেই শব্দমালাই তৈরি করে তাঁর কবিতার শরীর। তাহলে শিল্পী কী করবেন? শব্দের ধ্বনিকে কি তিনি অনুবাদ করে নেবেন দৃশ্যতার ভাষায়। তাঁর ভাষা তো 'রূপ'। ভর্তৃহরি সূত্রটি এইখানে সহায়ক হয়ে ওঠে শিল্পীর পক্ষে। 'বপু'-র কথা বলেছেন ভর্তৃহরি। ভাবনার সেই শরীরকে শিল্পী সরাসরি তুলে আনতে পারেন চিত্রপটে।

অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর ভাবনা সম্পর্কিত চতুর্থ সূত্রে বলেছেন : 'ভাবনার মধ্যে পরীক্ষণ, তর্ক ও সৃষ্টিমূলক কল্পনা-এ সবই ওতপ্রোত হয়ে আছে।' অর্থাৎ ভাবনার মধ্যে কল্পনা মিশে থাকে। কল্পনা ভাবনারই অঙ্গ। কিন্তু সব ভানা কল্পনা নয়। কল্পনার মধ্যে সৃজনের নবীনতা থাকতে হয়।

-দুই-

কল্পনার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা (বৈশাখ, ১২৯৯) এক চিঠিতে বলেছিলেন, 'এ কথা একটা চিরসত্য যে, যাদের কল্পনাশক্তি আছে তারা সৌন্দর্যকে নির্জীবভাবে দেখতে পারে না। তারা অনুভব করে যে, সৌন্দর্য যদিও বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা যেন বস্তুর অতীত, তার মধ্যে যেন একটা মনের ধর্ম আছে।' এ থেকে বোঝা যায় যে কল্পনা কেবল স্রষ্টার সৃজনের উৎস নয়, যিনি পাঠক কল্পনা তাঁর অনুভবকেও সমৃদ্ধ করে। কল্পনার আভিধানিক অর্থ উদভাবনা বা উদ্ভাবনী শক্তি। এই উদ্ভাবনী শক্তিই শিল্পীর সৃজনের মূল উৎস। তেমনি দর্শক বা পাঠক যিনি, তার দেখা বা পড়াকে গভীরতর তাৎপর্যে অন্বিত করতেও প্রয়োজন হয় এই উদ্ভাবনী শক্তি বা কল্পনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কল্পনাকে বলেছেন দেবী সরস্বতীর একান্ত সহচর। চতুর্দশপদী কবিতায় পাই এরকম উক্তি : 'লও দাসে সঙ্গে সঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে, বাগ্দেরীর প্রিয়সখি।' আর একটি চতুর্দশপদীতে বলেছেন, 'সেই কবি মোর মতো কল্পনাসুন্দরী যার মনঃকলমেতে পাতেন আসন।' তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তাঁর কবিত্বশক্তিকে উদবোধিত করতে শরণাপন্ন হয়েছেন 'মধুকরী কল্পনা'-র। বলেছেন : 'তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী কল্পনা। কবির চিত্তফুলবনমধু লয়ে রচ মধুচক্র'। কল্পনাকে তিনি তুলনা করেছেন মৌমাছির সঙ্গে, যে মৌমাছি কবির অন্তরে বা চেতনার ভিতরে রয়েছে যে সৃজনের উৎস, প্রস্ফুটিত যে ফুল, তার থেকে মধু সংগ্রহ করে 'মধুচক্র' বা মৌচাক তৈরি করবে। অর্থাৎ সজনের এই মধভাণ্ডার তৈরি করতে প্রয়োজন হল কল্পনার।

আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করব, তাহলে কল্পনা-র প্রকৃত সংজ্ঞা কী হতে পারে। বাস্তব জগৎ মানুষের মনে যে প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করে তাকে রূপান্তরিত করে নতুন প্রতিমাকল্প বা ইমেজ গড়ে তোলার যে মানবিক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকেই বলা হয় কল্পনা। কোনো একটি দর্শনের অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী : 'Imagination is the ability to create new Sensuous or thought images in the human consciousness, based on the conversion of imapression received from reality.'

কল্পনার পূর্ববর্তী মনস্তাত্ত্বিক আরও দুটি স্তর আছে। প্রথমটি হল প্রত্যক্ষণ বা perception। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, কান দিয়ে শুনি, এসবই আমাদের মন বা চেতনার ভিতর সঞ্চিত হয়। একে বলে প্রত্যক্ষণ। আমরা আগে যা দেখেছি ও শুনেছি, মনের ভিতর তাকে আমরা আবার জাগিয়ে তুলতে পারি, এই প্রক্রিয়াকে বলে স্মরণক্রিয়া বা recollection। এই স্মরণের আধার হচ্ছে স্মৃতি বা memory। এই স্মৃতির ভিতর ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয় অজস্র প্রত্যক্ষণ-সঞ্জান প্রতিমাকল্প বা image। মানুষের মনের বা চেতনের একটি বিশেষ ক্ষমতা হল এরকম যে ওই সঞ্চিত প্রতিমাগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা দ্বান্দ্বিকতায় ওই প্রতিমা সমৃদ্ধ এবং একইসঙ্গে প্রতিমা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র এক প্রতিমা বা image গড়ে তুলতে পারে সে। এই যে বাস্তব প্রত্যক্ষণ-সম্পৃক্ত অথচ বাস্তবাতীত নবোন্মেষ-সঞ্জাত প্রতিমা স্বজনের যে ক্ষমতা, তাকেই বলে কল্পনা। আমরা প্রত্যক্ষণ থেকে মনে সঞ্চিত করে রাখতে পারি পাখি-র প্রতিমা। আবার অন্যদিকে সঞ্চিত হতে পারে বাস্তবে দীর্ঘদিন ধরে দেখা ঘোড়ার প্রতিমা। মনের ভিতর সঞ্চিত এই দুই প্রতিমাকল্পকে মিলিয়ে মানুষ তৈরি করতে পারে তৃতীয় একটি প্রতিমাকল্প, যার নাম দেওয়া যেতে পারে পক্ষীরাজ ঘোড়া, যে ঘোড়া পাখির মতো উড়তে পারে। এই পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। এটা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। এই বাস্তবাতীত প্রতিমা-স্বজনই কল্পনার নিজস্ব পরিসর।

কল্পনা যে সব সময় দুটি প্রত্যক্ষণ-সঞ্জাত প্রতিমাকে মিলিয়ে তৃতীয় একটি প্রতিমা তৈরি করে, তাই নয়। পক্ষীরাজ ঘোড়া, গণেশ মূর্তি বা নৃসিংহ মূর্তিই কল্পনার শ্রেষ্ঠঅবদান নয়। মানুষ ছবিতে কবিতায় একটি ঘোড়া বা পাখি-র প্রতিমাকেই রূপান্তরিত করে, বিশ্লিষ্ট বা বিমূর্তায়িত করে কত ভিন্ন মাত্রার অর্থে অর্থান্বিত করে তোলে! এই রূপান্তরণও কল্পনারই অবদান। পিকাসো-র গের্নিকা' ছবিতে ঘোড়া বা ষাড়ের মুণ্ড যেভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে তাতে যে ভয়ঙ্করতা বা মানবিক নিষ্ঠুরতার প্রতীক তৈরি হয়েছে, এটা পিকাসোর কল্পনারই বিশেষ অবদান। কবি জীবনানন্দ যখন লেখেন 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য— তখন অতীত ইতিহাসের দুটি প্রতিমাকল্প স্মৃতি থেকে তুলে এনে তাঁর মানবীর প্রতিমার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। তাতে মানবী মানবী-ই থেকে যায় কিন্তু তাতে বাস্তবাতীত অলৌকিক সৌন্দর্যের কিছু মাত্রার সঞ্চার ঘটে। এই বাস্তবসম্পৃক্ত বাস্তবাতীত বা অলৌকিকতার সঞ্চার ঘটানোই কল্পনার কাজ।

কল্পনার আবার নানা রকম প্রকারভেদ আছে। বাস্তব-ভিত্তিক কল্পনা যেমন আছে,

তেমনি অবাস্তব কল্পনাও আছে। স্বপ্নে যে প্রতিমা নিঃসৃত হয়, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না। তার উপর চেতন মনের কোনো নিয়ন্ত্রণও থাকে না। তাই স্বপ্নকে কল্পনা বলা হয়তো সমীচিন নয়। দিবাস্বপ্নে মানুষ জেগে থেকেই অনেক প্রতিমা উৎসারিত করে। কিন্তু সে সমস্ত প্রতিমা অবাস্তব ও এলোমেলো। তার ভিতর কোনো সৌন্দর্য বা সৃজনধর্মিতা থাকে না। কাজেই তা কল্পনা পদবাচ্য নয়। অপভ্রান্তি বা delusion-ও তাই। তা অসুস্থ মনের প্রকাশ।

কল্পনা শুধু যে শিল্পসৃজনেরই অবলম্বন, তা নয়। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই রয়েছে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপনকে সুন্দর করে তুলতে হলে যেমন কল্পনার প্রয়োজন। তেমনি কল্পনার বিশেষ ভূমিকা আছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই প্রথমে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানীর কল্পনায়, সেই ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে বিজ্ঞানী তাঁর সত্যে পৌঁছেছেন। এই যে সচেতন মনের অগোচরেই সত্যের বা অনৈসর্গিক প্রতিমার স্পন্দন অনুভব করে কোনো ব্যক্তি, বিজ্ঞানী বা শিল্পী এটা অলৌকিক কোনো ব্যাপার নয়। দীর্ঘ চর্চা ও অনুশীলনে চেতনা ক্রমশই পরিশীলিত হতে থাকে। পরিশীলিত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন তাঁর একটা অন্তর্দৃষ্টি বা intution তৈরি হয়। সেই অন্তর্দৃষ্টিতে সচেতন প্রয়াস ছাড়াই এমন অনেক অনুভব জেগে ওঠে মনে, যে সম্পর্কে সেই ব্যক্তি হয়তো পূর্বে অবহিত ছিলেন না। অনেক কবি বা শিল্পীই অনেক প্রতিমাকল্প পেয়ে যান সচেতন প্রয়াস ছাড়াই। স্বপ্নেও পেয়ে যান অনেকে। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকের প্রাথমিক রূপরেখাটি স্বপ্নে পেয়েছিলেন কোনো এক ট্রেনযাত্রার সময়।

কবি বা শিল্পীর কল্পনার বিস্তার তাঁর শিল্প-প্রকাশকেও বিস্তৃততর করে। সেই বিস্তৃতি বা বিশ্বব্যাপ্তিই শিল্পের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য'-গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের তাৎপর্য'-এ লিখেছেন, 'কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।' তাই শিল্পীর মহত্ত্ব নির্ভর করে তাঁর কল্পনার বিস্তার ও গভীরতার উপর।

কল্পনার উপর বাস্তবের নিয়ন্ত্রণ যত শিথিল হয় কল্পনা তত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাতন্ত্র্যময় হতে পারে। শিশুরা যে স্বভাবতই শিল্পী, তার কারণ একদিকে যেমন অমলিন বিস্ময়বোধ, তেমনি অন্য দিকে বাস্তবের নিয়ন্ত্রণহীন কল্পনার অবাধ বিস্তার, যা তার খেলাকে যেমন সৌন্দর্যদীপ্ত করে, তেমনি তাঁর শিল্পসৃষ্টিকেই অসামান্য মাধুর্যময় ও নান্দনিকভাবে স্বাতন্ত্র্যময় করে। শিশুর যত বয়স বাড়ে ততই তার উপর বাস্তবের অভিঘাত বাড়তে থাকে। ক্রমশ যত যে বাস্তব-সচেতন হয়, ততই তার কল্পনার উন্মুক্ততা অবরুদ্ধ হতে থাকে। তাকে তখন চেষ্টা করতে হয় বা সাধনা করতে হয় কল্পনাকে মুক্ত করতে। এজন্যই পিকাসো বলেছিলেন, শৈশবে তিনি রাফায়েলের মতো আঁকতে পারতেন। আর বড় হয়ে সারা জীবন তাঁকে চেষ্টা করতে হয়েছে শিশুর সারল্যে পৌঁছতে।

শিশুর কল্পনা, রূপদক্ষ, শিল্পীর কল্পনা এবং সাধারণ মানুষের কল্পনার পার্থক্য কোথায়, এ নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্মৃতি ও শক্তি' শীর্ষক নিবন্ধে। তাঁর কথা কিছুটা শুনে নিতে পারি আমরা।

> 'ছেলেখেলায় থাকে ছেলেটির অফুরন্ত কল্পনা, নতুন নতুন সমস্ত খেলার রূপ সে রচনা করে চলে কোনো একটা পূর্বেকার খেলার স্মৃতি ধরে, ছেলে যে খেলে চললো সব সময় তা নয়, অপরূপ সমস্ত ব্যাপার কল্পনার দ্বারায় মূর্তিমান করে তুললে ছেলে। রূপদক্ষের মধ্যেও এইরকমের প্রবৃত্তি করায় তাকে নতুন-নতুন সৃষ্টি করার দিকে। অসামান্য শক্তি পেয়ে রূপদক্ষ সে রূপকল্পনায় দক্ষ হল, আর যে মানুষটি শুধু সামান্য রূপ দখল করলে, রূপ কল্পনা করতে পারলে না— যেমন হাতি যেমন ঘোড়া যেমন মানুষ যেমন গাছ তেমনিই দেখিয়ে চললো,— সে হল সামান্য রূপকর্মী'। (পৃ. ২৭০)

শিল্পী ও 'সামান্য রূপকর্মী'-র মধ্যে পার্থক্যের মূলে আছে কল্পনা। 'সামান্য রূপকর্মী'-র রচনায় বিষয়টা পরিস্ফুট হল ঠিকই, কিন্তু তাতে ভাবের ব্যঞ্জনা ঘটল না। তাই শিল্প হয়ে উঠল না তা। রূপদক্ষ শিল্পী তাঁর কল্পনা দিয়ে রচিত বিষয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। কল্পনা তাঁর সৃজনকে মোহময় করে তুললো।

কল্পনার সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক কী— এ বিষয়েও আলোকপাত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে। মানুষ সারা জীবন ধরে যা কিছু দেখে, শোনে বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সমস্তই তার মন বা চেতনার গভীরে সঞ্চিত থাকে। প্রত্যক্ষণ-সঞ্জাত সঞ্চিত সেই প্রতিমাপুঞ্জকেই স্মৃতি বলা যেতে পারে। অনেক স্মৃতি চেতনার গভীরে ডুবে যেতে যেতে আপাত-বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। কিন্তু হারিয়ে যায় না। চেতনার গভীরে ডুবে যাওয়া এই প্রতিমাপুঞ্জকে মগ্নচেতনা বা Subconeious বলে। এই মগ্নচেতনার ভিতর কেবল যে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ সঞ্জাত স্মৃতিই থাকে, তা নয়। থেকে যায় তাঁর জিন-বাহিত উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব প্রজন্মের বহু অভিজ্ঞতার সারাৎসারও। কোনো পরিশীলিত মন তাঁর চেতনায় ও মগ্নচেতনায় সঞ্চিত স্মৃতির রসায়ন থেকে গড়ে তুলতে পারে ওই স্মৃতি নিরপেক্ষ প্রতিমা ও প্রতীক। এই যে নতুন প্রতিমার নির্মাণ, এখানেই থাকে কল্পনা-র বিশেষ ভূমিকা। যাঁর কল্পনা যত স্বকীয়তা-সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাদীপ্ত সে তত সৃজনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। কল্পনা ও স্মৃতির সম্পর্ক নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখছেন :

> 'কল্পনার ক্রিয়া আর স্মৃতির গতি দুইয়ের কাজ এককে বহু করে দেখা,— কল্পনা দেখায় রূপের দিক দিয়ে বিভিন্ন এবং বহু, স্মৃতি দেখায় ভাবের দিক থেকে বিভিন্ন এবং বহু। অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের স্মৃতি— এই হল দুই পথ রূপজগতের যাত্রী শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা এবং এই দুই পথের খবর এঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।' (পৃ. ২৭২)

কল্পনা অনেক সময়ই স্মৃতি-নির্ভর কিন্তু স্মৃতির হুবহু প্রতিলিপি নয়। সব স্মৃতিই

কল্পনা নয়। কিন্তু কল্পনার ভিতর স্মৃতির কারুকাজ থাকতে পারে। পরিচিত স্মৃতি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্মৃতিসম্পৃক্ত অথচ স্মৃতি-নিরপেক্ষ নতুন প্রতিমাকল্পের যে উদ্ভাবন, সেটাই কল্পনার নিজস্ব ক্ষেত্র। সুকুমার রায়ের 'বকচ্ছপ', 'হাঁসজারু', 'টিয়েমুখো গিরগিটি' ইত্যাদি এই কল্পনারই অনবদ্য সৃষ্টি।

Jean-Paul Sartre ১৯৪৮-এ ফরাসি ভাষায় রচিত (১৯৬৬-তে ইংরেজিতে অনূদিত) 'The Psychology of Imagination' গ্রন্থে দর্শন ও মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কল্পনার স্বরূপ ও তাৎপর্য উদঘাটন করেছেন প্রজ্ঞাদীপ্তভাবে, কল্পনা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনায় যা নতুন দিগন্ত উন্মীলিত করেছিল। গ্রন্থের শুরুতেই লেখক কল্পনাকে বাস্তব থেকে আলাদা করেছেন। কল্পনাকে বলেছেন অবাস্তবের জগৎ 'a world of unrealities.' অর্থাৎ বাস্তবকে রূপান্তরিত করাই কল্পনার কাজ। তাঁর দৃষ্টিতে চিত্রকল্প চেতনারই নির্মাণ, 'The image is Consciousness' (পৃ. ১৩৭)। কিন্তু প্রতিমা উদ্ভাবনকারী চেতনা প্রত্যক্ষণ-নিরপেক্ষ। 'For us the image represents a certain type of consciousness which is completely independent of the perception type and correctively, a type of existence sui generis (unique) of its objects' (পৃ. ১২০)

এই চেতনা যে কল্পনা উৎসারিত করে তাকে তিনি বলেছেন এক জাদু-প্রক্রিয়া। 'we have seen that the act of imagination is a magical one. It is an incantation destined to produce the object of one's thought, the thing of desire, in a manner that one can take possession of it' (প. ১৫৯) ব্যক্তির চিন্তা থেকেই উৎসারিত হয় প্রতিমা, কিন্তু তা এক সম্মোহনের মতো। তথাকথিত বাস্তবকে তা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বাস্তব বিলুপ্ত হয় না, তা থাকে কিন্তু ধরা-ছোয়ার বাইরে চলে যায়। 'For the rest, the object as an image is an unreality. It is no doubt present, but at the same time, it is out of reach.' (পৃ. ১৫৯) একজন শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি তো সম্মোহনের বশবর্তী হনই। চেতনার সম্মোহন-সঞ্জাত যে প্রতিমাপুঞ্জ, সেটাই কল্পনার ফসল।

Sartre দেখিয়েছেন যে এভাবেই কল্পনা সত্তার এক স্বাধীনতা নির্মাণ করে, যে স্বাধীনতাতে সত্তার যেমন মুক্তি, তেমনি কল্পনারও। মানুষের সৃজনই তাঁকে সমস্ত জাগতিক বন্ধনের উর্ধ্বে নিয়ে যায়। কল্পনাই সেই মুক্তির রূপকার। কল্পনা চেতনার কোনো পরীক্ষালব্ধ বা প্রয়োগবাদী ক্ষমতা নয়, এটা সম্পূর্ণ চৈতন্যেরই প্রকাশ, যে চৈতন্য প্রচলিত বাস্তবের উপরে উঠে বাস্তবের সীমাকে প্রসারিত করে বা নতুন বাস্তব তৈরি করে এবং এই প্রক্রিয়ার স্বাধীনতার নির্মাণ করে। Sartre-এর ভাষায় :

> 'imagination is not an empirical or superadded power of consciousness, it is the whole of conciousness as it realises its freedom/every concrete and real situation of consciousness in the world is big

with imagination in as much as it always presents itself as a with drawing from the real.' (পৃ. ২৪৩)

এজন্য Sartre কল্পনাকে বলেছেন চেতনার একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা। কল্পনা বাস্তবকে শূন্যতায় (nothingness) বিলীন করে বাস্তবকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। ব্যক্তির বা শিল্পীর আত্মদীপ প্রজ্জ্বলিত করে।

-তিন-

কল্পনা : প্রাগৈতিহাসিক থেকে ধ্রুপদি যুগ

যুগ যুগ ধরে কবি ও শিল্পীর ভিতর কিভাবে কাজ করেছে এই কল্পনা, কিভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে নব নব সৃষ্টিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে কল্পনা-উৎসারিত সৃজন, সেটাই অনুধাবনের চেষ্টা করব এই লেখার বাকি অংশে।

মানুষের কল্পনা-সঞ্জাত শিল্পসৃষ্টির সূচনা কবে থেকে? আর্নষ্ট ফিশার (Ernst Fischer) বলেছেন, 'the first toolmaker was the first artist.' যখন থেকে মানুষ পাথর ভেঙে অস্ত্র বানাতে শুরু করল, তখন থেকেই তার শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটল। ফিশার আরও বলেছেন 'art was a magic tool'। আদিম মানুষের কাছে শিল্প ছিল একটি জাদু-প্রক্রিয়া। আমরা একটু আগে জেনেছি Sartre বলেছিলেন কল্পনাও একটি জাদু-প্রক্রিয়া। আদিম মানুষের শিল্পের ভিতর যে জাদু-প্রক্রিয়া, তা যে তার কল্পনারই একটি অভিব্যক্তি, এই ভাবনা হয়তো অমূলক নয়।

আদি মানুষের শিল্পের ধারাকে বুঝতে হলে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কালসীমা আমাদের মনে রাখতে হয়। পশু থেকে রূপান্তরণের পথে যে মানুষের প্রথম পদপাত, তাকে বলা হয় 'নিয়ানডার্থাল ম্যান'। এই 'নিয়ানডার্থাল ম্যান'। বিবর্তিত হয়ে এল 'হোমো স্যাপিয়েন।' তারা যখন পাথরে অস্ত্র বানাতে শিখল সেই পর্যায়কে বলা হয় প্রত্ন-প্রস্তর যুগ বা আপার পলিওলিমিক পিরিয়ড। এর কালসীমা হল তিরিশ হাজার থেকে দশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের পরে এল মধ্যপ্রস্তর যুগ। মধ্য প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে মানুষ প্রজাতি নব্যপ্রস্তর যুগে পদার্পণ করল। সেটা ছিল আনুমানিক আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ। শিকারজীবী নরগোষ্ঠীর কিছু অংশ তখন কৃষিজীবী হল।

প্রত্ন ও নব্য-প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। ভারতবর্ষে আদিতম গুহাচিত্র পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের হোশাঙ্গাবাদে এবং ভিমবেটকায়। ভিমবেটকার অনেক গুহাচিত্রই এখনও খুব সজীব অবস্থায় রয়েছে। আমরা তারই কিছু নিদর্শন থেকে সেই সময়ের আদিম মানুষের কল্পনার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করব। ভিমবেটকা ভূপাল থেকে ৪৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সংলগ্ন গভীর অরণ্য সেখানে। সেই অরণ্যে অজস্র পাহাড়। পাহাড়ে আছে নানা আকৃতির গুহা। প্রায় ৫০০ গুহায় আদিম মানুষের চিত্রচর্চার নিদর্শন আছে। এই ছবিতে আমরা দেখতে পাই কেমন করে আদিম শিল্পী-মানুষ তার অঙ্কনের

মূল বিষয়টিকে মৌল-রূপে রূপান্তরিত করে নিত। যেমন একটি ছবিতে সে আঁকছে চলমান একটি মানুষের ছবি। মানুষটির বাঁ-হাতটি কোমরে উপর স্থাপিত। তাতে দেহস্থ পিঠের রেখার সঙ্গে হাতের রেখার সমন্বয়ে একটি অর্ধবৃত্তাকৃতি ত্রিকোণ তৈরি হয়েছে। ডান হাতটি উপর দিকে তোলা। সেই হাতে হয়তো গাছের ডাল বা কোনো বাঁকানো ছড়ি বা লাঠি ধরা আছে। চলার ভঙ্গিতে তার প্রসারিত শীর্ণ, দীর্ঘ পা-দুটি ভূমির সঙ্গে একটি ত্রিকোণাকৃতি তৈরি করেছে। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত তার মূল যে দেহকাণ্ড, প্রসারিত পা-দুটির বিপরীতে তা-ও একটি ত্রিকোণাকৃতি তৈরি করেছে। এখন আমরা যাকে ছবির রচনাবিন্যাস বা কম্পোজিশন বলি, সেদিক থেকে দেখলে ছবিটিতে কয়েকটি সমধর্মী বিপরীত-প্রান্তিক জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়ে একদিকে যেমন চলমান মানুষের জঙ্গমতার সারাৎসারটুকু রূপবদ্ধ হয়েছে অন্যদিকে জ্যামিতিকতার এমন এক সৌষম্য এসেছে যা অবয়বের উপস্থাপনাকে বিশেষ এক নান্দনিক মাত্রা দিয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পী-মানুষ বাস্তবের চলমান মানুষকে দেখে তার এই যে চিত্রপ্রতিমা তৈরি করেছে, এটা কি সম্ভব হত যদি রূপকে রূপান্তরিত করার যথেষ্ট কল্পনাশক্তি তার না থাকত? বিংশ শতকে আমরা দেখেছি পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিকতাবাদী শিল্পী অবয়বকে এরকম, মৌলরূপে রূপান্তরিত করেছেন। জিয়াকোমেত্তি-র ভাস্কর্যে মনুষ্যরূপের এরকম শীর্ণাকৃতি সরলীকরণ আমরা অজস্র দেখতে পাই। পিকাসো 'স্টিক-স্ট্যাচু' বলে এরকম শীর্ণাকৃতি মানুষের রূপ গড়েছিলেন একবার তাঁর ভাস্কর্যে। আমাদের রামকিঙ্করের ১৯৩৫-এ করা 'সুজাতা' শীর্ষক ভাস্কর্যটিও এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক। এখানে আমরা দেখতে পাই, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষের কল্পনা কেমন করে অনুপ্রাণিত করেছে বিংশ শতকের আধুনিক শিল্পীর কল্পনাকে। ভিমবেটকার গুহাগাত্রে এরকম আরও অজস্র ছবি আছে, যুদ্ধের ছবি, যুথবদ্ধ বিভিন্ন পশুর ছবি, ছুটন্ত বাইসনের বা সুস্থিত বরাহের রূপারোপ, সর্বত্রই শিল্পী কল্পনার সাহায্যে মৌলরূপটি আবিষ্কার করেছেন। কল্পনা ছাড়া এই রূপারোপ সম্ভব হত না।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম শিল্পকলা দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হয়েছে। সময়ের ভিতর দিয়ে যত অগ্রসর হয়েছে মানুষ ততই তার কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধ করেছে। তার শিল্প-প্রকাশও উন্নত হয়েছে। ভারতবর্ষে ইতিহাসের উষালগ্নে সৃষ্ট যে শিল্প-নিদর্শন আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তার প্রকাশ ঘটেছিল সিন্ধু-সভ্যতায়। সিন্ধু-সভ্যতার কালকে বলা হয় প্রোটো-হিস্টরিক। অর্থাৎ ইতিহাসের কাল শুরু হল এখান থেকে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও চানহুদারোতে সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃত কিছু অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯৩১ সালে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে এখান থেকে, যার অনেকগুলিরই আনুমানিক সৃজনকাল ৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এখানে এসে আমরা দেখতে পাই শিল্পীর কল্পনা ও রূপায়ণ-পদ্ধতি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।

মহেঞ্জোদারোর তিনটি সিল— ত্রিমস্তক বিশিষ্ট প্রাণী, ত্রিমস্তক বিশিষ্ট দেবতা, ষাঁড়ের মূর্তি, ছোট আকারে হলেও এর রূপায়ণের ভিতর যে সংহত শক্তির প্রকাশ, তা কল্পনার

সমৃদ্ধিই সূচিত করে। মহেঞ্জোদারোর এই ষাঁড় তো আজও আমাদের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া চুনা-পাথরের শ্মশ্রুশোভিত আবক্ষ পুরুষ-মূর্তি, দণ্ডায়মানা সালঙ্কারা নগ্নিকা তাম্রমূর্তি, হরপ্পা-র চুনাপাথরে পুরুষের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহকাণ্ড বা নৃত্যরতা নারীমূর্তি— ইত্যাদি ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিতে অনুভব করা যায় শিল্পীর কল্পনা বাস্তবের ভিতর থেকেই কেমন করে বাস্তবাতীত অলৌকিকের সন্ধান করেছে।

প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে সিন্ধু-সভ্যতা পর্যন্ত দৃশ্যকলা মানুষের কল্পনার বিবর্তনের খানিকটা আভাস আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করলাম। কবিতায় বা সাহিত্যে মানুষের কল্পনার হদিশ পাওয়া যায় কবে থেকে? ভারতবর্ষে লিখিত লিপি আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই বচনের মাধ্যমে বা শ্রুতির মধ্য দিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। এই শ্রাব্য-সাহিত্য বা কবিতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের সূচনায় রয়েছে ঋক-বেদ। বেদ ধারণ করে আছে বৈদিক ঋষিদের প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা কল্পনা-প্রসূত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই কল্পনার সৌকর্যে কবিতায় পল্লবিত হয়েছে। ঋকবেদের আনুমানিক রচনাকাল ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১০০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তখন পশুপালন ছিল আর্যদের প্রধান জীবিকা। প্রকৃতির শক্তিগুলিকে তাঁরা দেবতা বলে গণ্য করতেন। জীবনের কল্যাণ কামনায়, জীবনকে সফল ও সার্থক করার প্রত্যাশায় তাঁরা কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যের মধ্যে বেদের সূক্তগুলির মধ্যেও জাদু-র ক্রিয়া ও সৌকর্য ছিল। লৌকিক অনুষঙ্গের ভিতরই অলৌকিকের আভাস আনতে চেয়েছেন বৈদিক ঋষিরা তাঁদের স্মৃতিধৃত সূক্তের মধ্য দিয়ে।

আমরা ঋক-বেদের একেবারে প্রথম সূক্তটির দিকে একটু তাকাবো, মানুষের কাব্যসৃষ্টির একেবারে আদিপর্বে তাঁর কবি-কল্পনার কিছুটা আভাস পেতে। প্রথম সূক্তটিতে আছে অগ্নির বন্দনা। জীবনে অগ্নির উপযোগিতা অশেষ। অগ্নি যজ্ঞের প্রধান বাহন বা উপকরণ। যজ্ঞের মধ্য দিয়েই আর্যঋষিরা সমস্ত দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতেন। কাজেই অগ্নিকে তাঁরা তাঁদের কল্পনায় বাস্তবোত্তীর্ণ এক অবস্থানে বসিয়েছিলেন। তারই পরিচয় পাই এই সূক্তটিতে। আমরা মাত্র প্রথম দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজন। হোতারং রত্ন ধাতমম্।। ১
অগ্নি পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরূত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি।। ২

রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুবাদে এর অর্থ এরকম :

১। 'অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।'

২। 'অগ্নি পূর্বে ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদের স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এ যজ্ঞে আনুন।'

এখানে যে কল্পনার পরিচয় পাই তা খুবই বাস্তব-ভিত্তিক এবং বলা যেতে পারে উপযোগবাদী। এই কল্পনাই ধীরে ধীরে পরিশীলিত হয়েছে। উপনিষদের যুগে পৌঁছে প্রাচীন ভারতের কবির কল্পনা কত উদাত্ততা লাভ করেছে তার পরিচয় আমরা পাই

ব্রহ্মের ধারণা এবং ব্রহ্মের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক নির্ধারণে। উপনিষদের কবি যখন বলেন 'ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম/যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ/তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা :' ইত্যাদি তখন তাঁর কল্পনার অপরিমেয় বিস্তার মানবিক চেতনার অনন্ত সম্ভাবনার স্মারক হয়ে ওঠে। প্রধান উপনিষদগুলির রচনাকাল খ্রি. পূ. অষ্টম শতক বলে নির্ণীত হয়েছে। ওদিকে ঋক্-বেদের রচনাকাল আমরা দেখেছি খ্রি. পূ. ১০০০ থেকে খ্রি. পূ. ৯০০। তাহলে প্রায় ২০০ বছরে ভারতের কবি-কল্পনার এই ভূমি থেকে ভূমা পর্যন্ত বিস্তার অসামান্য আলোর ইঙ্গিতবাহী নিঃসন্দেহে।

ধ্রুপদি যুগে ভারতীয় শিল্পীর কল্পনা যেন আকাশ ভরা বিস্তার পেল। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুপ্তবংশের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতির যে বিকাশ শুরু হয়েছিল কুষাণযুগে, তা-ই সফলতার আলোকবিন্দু স্পর্শ করে গুপ্ত যুগে। গুপ্তযুগের বিকাশ ও বিস্তারকাল ৩২০ থেকে ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এই কালপর্বের কয়েকশত বছর আগে থেকে কয়েকশত বছর পরে পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রছায়ায় ভারতে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রে বিকাশ, তা অতুলনীয় বৈভবময়। পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ এই সময়।

স্থাপত্য, ভাস্কর্যের উন্মীলনের দিক থেকে সাঁচী অনন্য। খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রায় একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এখানে কাজ হয়েছে। অজন্তার গুহাগুলিতেও ছবি আঁকা হয়েছে প্রায় নয়-শত বছর ধরে, খ্রি. পূ. দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত। আমরা প্রথমে সাঁচী-র একটি ভাস্কর্য ও অজন্তার একটি ছবিতে দেখব শিল্পীর কল্পনার স্বরূপ। পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত কালিদাসের কাব্যে কল্পনার যে সংবেদনময় শরীরী নিবিষ্টতা থেকে মহাকাশের উদাত্ততা পর্যন্ত বিস্তার, তারও কিছুটা আভাস পেতে চেষ্টা করব।

সাঁচী-র পূর্ব তোরণের যক্ষী মূর্তিটিতে দেখি শরীরী সংবেদনের অসামান্য উন্মুক্ততা। একটি আম্রবৃক্ষের ডাল ধরে কৌণিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এক নগ্নিকা যুবতী। সমগ্র তোরণের প্রেক্ষাপটে দেখলে সে হয়ে ওঠে সেই তোরণের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যেন বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পৃক্ত। কিন্তু আলাদা করে যদি এই নগ্নিকার দিকে তাকাই তাহলে মনে হয় সে যেন তার যৌবন দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আনন্দে উদ্ভাসিত করতে চাইছে। সমগ্র প্রকল্পটির যিনি পরিকল্পক সেই শিল্পীর কল্পনার গভীরতা আজও আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

এরপর আমরা দেখব অজন্তার এক নম্বর গুহার একটি ছবি— 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি'। এটি পঞ্চম শতকের রচনা। সম্মুখপটে পদ্ম হাতে বোধিসত্ত্বের আলোকিত ছন্দিত উপস্থাপনা। পশ্চাৎপটে জীবন ও প্রকৃতির পরিব্যাপ্ত অবলোকন। পার্সপেকটিভ বা প্রেক্ষাপট বিন্যাস এখানে পাশ্চাত্যের স্বাভাবিকতাবাদী আঙ্গিক থেকে একেবারেই আলাদা। দূরকে নিকটে নিয়ে আসার যে উদ্ভাবনী সৌকর্য, কল্পনার যে স্বকীয়তা, ভারতীয় চিত্রকলা দেখিয়েছে, তার পরিচয় এই ছবিটিতেও রয়েছে। লৌকিক-অলৌকিকের সমন্বয়ের

মধ্য দিয়ে জীবনের তন্ময় সুরকে তুলে ধরেছে উপরোক্ত দুটি শিল্পকর্ম। শিল্পীর কল্পনা যেন আকাশী বিস্তার পেয়েছে।

পাশাপাশি আমরা দেখব এই ধ্রুপদি যুগে কাব্যে কল্পনার বিস্তারের দিকটি। আমরা একজন কবিকেই মাত্র বেছে নেব দৃষ্টান্ত হিসেবে। তিনি কালিদাস। কালিদাসের কাল নিয়ে অনেক ভিন্ন-মত আছে। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে খিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাব-কালের কথা বলেছেন বিভিন্ন তাত্ত্বিক। তবে আজ এটা প্রায় স্বীকৃত যে কালিদাসের প্রথম যুগের কাব্যগুলো রচিত হয়েছিল ৪১৩ খ্রিস্টাব্দের আগে। সেই হিসেবে তাঁকে গুপ্তযুগের কবি বলা যায়। শিল্পে যে সংবেদনময়তা, কল্পনার যে উদাত্ততা ও তন্ময়তা দেখি আমরা এই যুগে কাব্যেও তা অনুভব করা যায়। আমরা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের 'পূর্বমেঘ'-এর দুটি স্তোত্র উদ্ধৃত করব দৃষ্টান্ত হিসেবে। ২০-সংখ্যক অনুচ্ছেদটি বাংলা অনুবাদে এরকম :

'ওগো মেঘ, তুমি তো সেখানে বর্ষণ করবেই; কিন্তু বর্ষণের পর যখন হালকা হবে তখন গজমদধারায় সুবাসিত রেবার জলধারা পান করে নিয়ো। তুমি সারবান হলে বায়ু আর তোমাকে যেখানে খুশী উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যে লঘু সে-ই সর্বাংশে রিক্ত, যে পূর্ণ তার গৌরব সর্বত্র।' ২০

শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। রিক্ততা ও পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যকে অসামান্য ক্ষমতা বুঝিয়েছেন কবি। এর পরে অনুচ্ছেদটি পড়লে আমরা বুঝব নিসর্গের নিবিড় সৌন্দর্যকে কল্পনার কি উদাত্ততায় উন্মীলিত করেছেন মেঘদূতের কবি। কাব্যের এই পরিসরটি দৃশ্যকলা থেকে একেবারেই আলাদা। কবি বর্ণনা করছেন :

> 'পথে যেতে যেতে তোমার বর্ষণের ফলে কদম্বফুল ফুটে উঠবে— সবুজ ও পাংশুবর্ণের মিলনে তাদের অপূর্ব শোভা। সেই ফুলের কেশর অর্ধেক উদগত! কোথাও নদীর তীরে তীরে ভুঁই চাঁপা ফুটে উঠবে; কোথাও বা বনভূমি দগ্ধ হয়েছিল, তোমার বর্ষণে মাটি থেকে এক মধুর গন্ধ উঠতে থাকবে— সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে চিত্রিত হরিণগুলি তোমার বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে। তারাই বলে দেবে সবাইকে কোন পথে তুমি গিয়েছ।' ২১

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগ থেকে ধ্রুপদি গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ভারতীয় কবি ও শিল্পীর কল্পনার বিবর্তন আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করলাম। এ এমন একটা সময় যখন প্রকৃতি পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে। যখন কবি বা শিল্পীও সেই পূর্ণতার ধ্যানে নিজের সত্তাকে উৎসর্গীকৃত রেখেছে। যখন প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে কোনো সংঘাত শুরু হয় নি, তখন কল্পনার স্বরূপ ছিল এরকম।

-চার-

পাশ্চাত্য : রেনেসাঁস থেকে আধুনিক

এবার আমরা চলে যাব পাশ্চাত্যে, একেবারে রেনেসাঁসের যুগে। রেনেসাঁসের কাল

মানবতার জয়যাত্রার কাল। যখন মানুষ প্রকৃতির উপর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত ও আত্তস্থ করতে চাইছে। প্রাচ্যের জীবনভাবনা ও কল্পনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের এখানেই পার্থক্য। পাশ্চাত্যশিল্পে ও কল্পনায় পার্থিবতা ও দৃশ্য-বাস্তবতাই প্রধান প্রস্থানবিন্দু। প্রাচ্য শিল্পে ও কল্পনায় মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টির চরম ও পরম অভিব্যক্তি নয়। প্রবহমান প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে অধ্যাত্মচেতনা ও নান্দনিক দর্শনের এই যে ভিত্তিগত ব্যবধান, এটা তাঁদের কল্পনা ও শিল্পপ্রকাশকে দুই অভিমুখী করছে। তবু আমরা দেখব অধ্যাত্মচেতনার আদর্শায়িত এক স্বরূপ আছে পাশ্চাত্যের শিল্পীর নন্দনবোধেও।

আমরা লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি-র (Leonardo da vinchi, 1452-1519) 'নোটবুক' থেকে তাঁর দু-একটি ভাবনা অনুধাবনের চেষ্টা করব। লিওনার্দো বলছেন আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষণ। 'All our knowledge has its origin in our perception.' (পৃ. ৮) এটাই হল রেনেসাঁস-কল্পনার ভিত্তি। সেখানে সমস্তই দৃশ্যমান বাস্তব-নির্ভর। লিওনার্দো বলছেন : 'যদি তুমি কোনো কাল্পনিক প্রাণীকে স্বাভাবিকতায় অন্বিত করতে চাও, যেমন তুমি চাও কোনো ড্রাগন আঁকতে', তাহলে বাস্তবের অন্য প্রাণীর স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তোমাকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। (পৃ. ১০৭)। প্রাচ্য কল্পনায় এরকম নয়। সেখানে লৌকিক সব সময়ই অলৌকিকের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়।

লিওনার্দোরও যে বিশিষ্ট এক আধ্যাত্মিকতার বোধ ছিল না, তা নয়। বলছেন তিনি : 'Our body is subject to heaven, and heaven is subject to the spirit.' (পৃ. ১৭৭) কিন্তু 'body', 'heaven' ও 'spirit' তিনটি স্বতন্ত্র সত্তা, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। তিনে মিলে একাত্ম নয়। এই দ্বৈত বা ত্রিমুখী চেতনারই পরিচয় পাওয়া যায় লিওনার্দো-র 'মোনালিসা' ছবিতে মিকেলেঞ্জোলোর (Michelangelo, 1475-1564) 'পিয়েতা' ভাস্কর্যে। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের কল্পনা পার্থিবতা-ভিত্তিক কল্পনা। প্রাচ্যের কল্পনায় রয়েছে অলৌকিকের স্পন্দন।

রেনেসাঁসের ইউরোপের শিল্পকল্পনার ভিতর অনেক সময়ই এক ধরনের পাপক্রোধের বিপন্নতা ও করুণা কাজ করেছে। সান্দ্রো বত্তিচেলি-র (Sandro Botticelli, 1444-1510) 'দ্য বার্থ অব ভেনার্স' সত্ত্বেও একথা সত্য। লিওনার্দো-র 'লাস্ট সাপার', মিকেলোঞ্জেলোর 'পিয়েতা'— এই করুণার নিদর্শন। সাহিত্যের এর প্রতিফলন খুব বিরল নয়। রেনেসাঁসের সাহিত্যের প্রধানতম রূপকার নিঃসন্দেহে শেক্সপিয়র (William Shakespeare, 1564-1616)। জীবনের অশান্ত আলোড়ন, বিপর্যয়, মানুষের অবদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ট্রাজেডিগুলিতে তীব্র বিষাদে ঝংকৃত হয়েছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় হ্যামলেটের আত্মকথন থেকে :

'O God! God!
How weary, state, flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!

Fie on't! ah fie'

একটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অনুভূতি ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। A. C. Bradley তাঁর 'Shakespearean Tragedy' গ্রন্থে বলেছেন :

> "This central feeling is the impression of waste. with shakespeare, at any rate, the pity and fear which are stirred by the tragic nstory seem to unite with, even to merge in, a profound sense of sadness and mystrey, which is due to this impression of waste. 'what a piece of work is man', we cry; 'so much more beautiful and so much more terrible than we know'!" (P-16)

এই বিপন্নতার কল্পনাকে পাশ্চাত্য কাটিয়ে উঠতে পারে নি আধুনিকতার বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্তও। বরং তা আরও বেড়েছে।

একেবারে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী ভ্যান গঘ-এ (১৮৫৩-১৮৯০) পৌঁছে এক আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনের বিপর্যয়কে মথিত করেই উঠে আসে সেই আলো। তার ১৯৮৫-র 'দ্য পটেটো ইটার্স'-এর দারিদ্রের যন্ত্রণা অতিক্রম করে ১৮৯০-এর 'ফিল্ড উইথ আ স্টারি স্কাই'-তে তিনি সেই অলৌকিক আলোর উৎসারণ ঘটাতে পাচ্ছেন। অথবা এরকম আরও অনেক ছবিতেই।

জুলাই ১৮৮০-তে ভ্যান গঘ তাঁর ভাই থিও-কে চিঠি লিখছেন :

> 'কেউ বলতে পারে না কী আমাদের বন্ধ করে রাখে, আটকে রাখে, ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু কিছু বাধা, কিছু প্রাচীরে উপস্থিতি মানুষ অনুভব করে। এসবই কি কল্পনা, কল্পভাবনা (fantasy)? আমার মনে হয় না। তারপর জিজ্ঞাসা করে সে— ঈশ্বর, এই বদ্ধতা কি দীর্ঘ সময়ের জন্য? চিরদিনের জন্য? তুমি কি জানো, কী আমাদের মুক্ত করে এই বদ্ধতা থেকে? তা হল গভীর স্নেহ, ভালবাসা, সহমর্মিতা। সেটাই জাদুর বিভার মতো চরম শক্তিতে কারাগারের দরজা খুলে দেয়। ...এই সহানুভূতিকে যদি নবীন করে নেওয়া যায়, তাহলেই জেগে ওঠে জীবন।' (পৃ. ১২৬) প্রেমের ভিতর দিয়ে এই উজ্জীবনের বার্তা ভ্যানগঘ দিয়ে গেছেন তাঁর অজস্র ছবিতে যেমন, তেমনি তাঁর পত্রসাহিত্যেও। মানবিক কল্পনাও যেন উজ্জীবন পায় তাঁর তুলিতে, কলমেও। শুধু লক্ষণীয় এটুকু 'কল্পনা' কথাটিকে শিল্পী এই উদ্ধৃতিতে যেন একটু ভুল অর্থে ব্যবহার করলেন। কল্পনা কি কোনো ভ্রান্তিময় ভাবনা, ফ্যানটাসি? কল্পনা কি প্রেমের বা উজ্জীবনের দরজাও নয়?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনার ধরন পাল্টায়। কল্পনার চরিত্রও পাল্টায়। উপরোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন ভ্যান গঘ ১৮৮০ সালে। তার পরে থেকে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত যে সময় সারা বিশ্বেই তা অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তার গহন প্রভাব পড়েছে কল্পনার উপরেও। পাশ্চাত্যে পোস্ট-ইম্প্রেশনিজমের কাল থেকে কিউবিজম ডাডাইজম সুররিয়ালিজম-এর কালের ব্যবধান খুব বেশি নয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে

প্রথম বিশ্বের পুঁজিবাদ লালিত ঔপনিবেশিকতা, এক কথায় যাকে 'ইমপেরিয়ালিজম' বলা যেতে পারে তা সারা বিশ্বে লোভ, হিংসা, যুদ্ধ ও ধ্বংসের যে প্রস্রবণ বইয়ে দিয়েছে তার তুলনা পূর্ববর্তী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোথাও ছিল না।

যে একক শিল্পীর কাজে পর্ব থেকে পর্বান্তরে এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, শিল্পের রূপের মতো কল্পনাকেও যিনি ভেঙেচুরে নতুন নতুন রূপে রূপান্তরিত করছিলেন, তিনি পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩)। তার 'নীল পর্যায়' থেকে 'সুররিয়ালিস্ট পর্যায়' পর্যন্ত কল্পনার যে উথাল পাথাল পরিবর্তন, তা তাঁর শিল্পের রূপেও আনছিল সাধারণের পক্ষে অকল্পনীয় সব ভাঙন। সে সমস্ত আজ প্রায় সকলেরই খুব জানা। দৃশ্যরূপ ভিত্তিক তাঁর এই বিস্তীর্ণ কল্পনার পাশাপাশি কাব্যরূপ বা শ্রাব্যরূপ ভিত্তিক কল্পনাতেও তিনি যে এক স্বতন্ত্র পরিসর তৈরি করেছিলেন, তার খানিকটা পরিচয় পেলে আমরা সেই সময়ের ভাঙনের চরিত্র সম্বন্ধেও খানিকটা ধারণা করতে পারব।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে পিকাসো লিখেছিলেন একটি নাটক। তার নাম ছিল ইংরেজি অনুবাদে 'Desire Caught by the Tail'। ফরাসি ভাষায় নাম ছিল 'Le Desire attape par la queue'। আরও একটি তিনি লিখেছিলেন আরও কয়েক বছর পর। ১৯৫২ সালে লেখা হয়েছিল 'The Four Little Girls' (Quatre Petites Filles)। এই দুটি নাটক নিয়ে অসামান্য এক প্রবন্ধ লিখেছিলেনু কবি শঙ্খ ঘোষ ১৯৮২ সালে। 'পিকাসো : তুলি থেকে কলম' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' বইতে। সেখান থেকে 'Desire' নাটকটির কিছু বাকপ্রতিমা যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলে কালের প্রবাহে শিল্পী-কবির কল্পনা এই বিশ্বপ্রবাহকে কেমন করে ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে সুররিয়ালিজমভিত্তিক বিমূর্ততার এক নতুন রূপ উৎসারিত করেছে। এরই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাকপ্রতিমা আমরা শুনে নিতে পারি। লিখেছিলেন পিকাসো :

> 'নীরবতাকে নগ্ন করে ঝোলের মধ্যে ফেলো, ঝোল যে ঠাণ্ডা হয়ে এল দ্রুত', 'কী প্রবল ঝড়! কী এক রাত', 'বহু বছরের ভার নিয়ে দিন নেমে যাচ্ছে এক অন্ধ কূপে', 'সমস্ত করুণাকে ফিরিয়ে দেওয়া রুদ্ধ জানলায় জানলায় ফেরি করে বেড়াচ্ছিল আমার দুঃখের পসরা, জন্মমৃত তারকার বরফহিম হাতের কাছে জ্যান্ত এগিয়ে দিচ্ছে আমার কিমা করা মাংস'...ইত্যাদি ইত্যাদি। (পৃ. ১১০)

এক রক্তঝরা ছিন্নভিন্ন কান্না যেন শুনতে পাই আমরা। আর এই ভাঙনের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধও তৈরি করেন এই শিল্পী-কবি, যখন তিনি বলেন :

'সমস্ত শক্তি দিয়ে এসো আমরা বুলেটের দিকে ছুড়ে দিই পায়রার ঝাঁক।' সুররিয়ালিজম আপাত-বিশৃঙ্খল যুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন কল্পনা কেমন করে জীবনের প্রকৃত বাস্তবের প্রতীক গড়ে তোলে তারই কিছু দৃষ্টান্ত দেখলাম আমরা পিকাসোর এই বাক্যমালায়।

আধুনিকতাবাদের অন্তপর্বে পাশ্চাত্যের শিল্পী কল্পনাকে যেভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিয়েছিলেন, তারই কিছু পরিচয় আমরা পেলাম পিকাসোর ওই বাক্যমালায়। বাস্তবের সমস্ত যুক্তি-অতিক্রান্ত অথচ প্রকট বাস্তব নিয়ে কল্পবাস্তবের দিকে কল্পনার যে বিস্তার তার

শ্রেষ্ঠতম এক রূপকার ছিলেন সুররিয়ালিস্ট শিল্পী সালভাদের দালি (১৯০৪-১৯৮৯)। সুররিয়ালিজম কল্পনাকে করে তুলেছিল নির্বাধ, সমস্ত যুক্তির শৃঙ্খলমুক্ত। এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান যাঁর, তিনি বিশ্ববিশ্রুত মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন চেতনার তিনটি স্তর :। এর প্রথম স্তরটিতে সঞ্চিত থাকে আদিমতার পর্যায় থেকে মানুষের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত সমস্ত ভাবনা বা কল্পনার উপর যদি বাইরের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া যায়, তাহলে মগ্নচেতনা থেকে উৎসারিত হয় যেসব প্রতিমাপুঞ্জ তাকে আপাতভাবে অসংলগ্ন মনে হলেও, তা থেকে নির্মাণ করা যায় সত্যের এক গভীরতর রূপ। কল্পনার এই অবাধ প্রবহমানতাই সুররিয়ালিজমের মূলগত বৈশিষ্ট্য। সালভাদোর দালি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'Diary of a Genius'-এ ফ্রয়েড-এর এই গুরুর উল্লেখ করে তার নিজের কাজে ফ্রয়েডের অবদানের কথা বলেছেন।

> 'Once more I thank Sigmund Freud and proclaim louder than ever his great truths. I Dali deep in a constant introspeetion and meticulous analysis of my smallest thoughts, have just discovered that, without realising this, I have painted nothing but rhinoceros horns all my life.' (পৃ. ৫২)

রেনেসাঁস বা এনলাইটেনমেন্টের পাশ্চাত্যে যুক্তির উপর নির্ভরতা ছিল বড় বেশি। শেক্সপিয়রেরা পর থেকে কল্পনার মুক্তির পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। রোমান্টিসিজম যেন কবিতায় সেই কল্পনার মুক্তির জন্যই আন্দোলন। প্রখ্যাত রোমান্টিক কবি শেলি বলেছিলেন— কবিতা যুক্তিবাদ বা ন্যায়শাস্ত্র থেকে আলাদা। মনের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের অধীন নয় কবিতা। ব্যক্তির সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে এর কোনো প্রয়োজনীয় সংযোগ নেই। শেলির নিজের ভাষায় :

> 'Poetry differs in this respect from logic, that it is not subject to the control, of the active powers of the mind, and that its birth and recurrence have no necessary connection with the consciousness or will.' (The Faber Book of modern Verse. Ed. Micheal Roberts. Faber. 1936. lutro. P. 19)

তবু বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, রোমান্টিকতাও কল্পনাকে নির্বাধ করতে পারে নি। কল্পনার উপর ভর করে থাকল জ্ঞানের ভার। 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

'যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি', সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠল, তখনও, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও, কবিতা ঠিক সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারলে না, তার দেহে লগ্ন হ'য়ে রইলো আঠারো শতকেরও অনেক উচ্ছিষ্ট : জ্ঞানের ভাব, উপদেশের ভাব, হিতৈষণার জঞ্জাল।' (পৃ. ১৮১)

বুদ্ধদেবের মতে কবিতাকে এইসব 'ভার' ও জঞ্জাল' থেকে মুক্ত করেছিলেন ফরাসি

কবি শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)। "তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্ল্যুর দ্যু মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭"। (পৃ. ১৮২)

বোদলেয়ার ছিলেন নাগরিক কবি। যা কিছু কৃত্রিম, যা কিছু মানুষ তৈরি করে তার শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে, তার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। হয়তো এই কৃত্রিমতাকে নন্দিত করার জন্যই চির রোমান্টিক ও ধ্রুপদি মননের কবি রবীন্দ্রনাথ তেমন পছন্দ করেননি বোদলেয়ারের কবিতা। 'আসবাবের কবি' বলেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর বোদলেয়ার মুগ্ধতার জবাবে! আসলে বোদলেয়ার প্রথম আধুনিক নন। তাঁকে বলা যায় প্রথম আধুনিকতাবাদী কবি (modermist)। সত্যের কোনো স্থির নির্ধারিত রূপ তাঁর কল্পনায় ছিল না। মানুষকেই নিরন্তর তৈরি করে নিতে হয় অসীমের অভিজ্ঞান। স্বকল্পিত সেই সার্থকতায় পৌঁছনোর জন্যই তাঁর পরিশ্রম, জীবন-সাধনা। বোদলেয়ার বলেন তাঁর 'আলোকস্তম্ভ' কবিতার শেষ দুটি লাইনে :

'এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার!'

সত্যের বা অসীমের এই যে হয়ে ওঠার বা গড়ে তোলার কল্পনা, এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বলা যেতে পারে পোস্ট-মডার্নের বীজও হয়তো ছিল বোদলেয়ারের মধ্যে।

বোদলেয়ারের পর ইউরোপের আধুনিকতাবাদী কবি-কল্পনা নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। সত্য ও সুন্দরের নানা রূপ কল্পনা করেছেন কবিরা। কিন্তু আত্মচ্যুত হয়ে যাওয়ার এক তীব্র বেদনাই স্বরাটত্ব পেয়েছে, যেমন দেখি টি. এস. এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) 'The waste Land' কবিতার এই ক'টি লাইনে। 'Burning burning burning burning/ O Lord Thou pluckest me out/ O Lord Thou pluckest burning.'

-পাঁচ-

ভারত : আধুনিক ও আধুনিকতাবাদী

কল্পনার ভিতর এই যে তীব্র হতাশা, আত্মপীড়ন, এর ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌঁছতে সময় লেগেছে অনেকটা। প্রায় ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত। এর আগে বিষাদ ছিল কিন্তু তার সঙ্গে ছিল নিঃশর্ত সমর্পণ। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে/সকল অহঙ্কার হে আমার চোখের জলে'। বিশ্বাসের এই নিবিড়তার জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ১৯১৩ সালে।

ছবি ও কবিতা— এই দুইয়েরই আধুনিকতার প্রথম পর্যায়ে কল্পনার ভিতর ছিল বিস্ময়ের মরমি আলো-ছায়া। অবনীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন কবি ও শিল্পী। তার অজস্র গদ্য রচনাই তো কবিতা-প্রতিম। ১৯১৫-তে তিনি লেখেন 'নালক'। ১৯১৪-১৫-তে বেরোতে থাকে 'পথে বিপথে'-র গল্পগুলি। 'ভূতপত্রীর দেশ' বেরোয় ১৯১৫-তে। ১৯১৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাংলার ব্রত'। ১৯২০-২১-এ 'বুড়ো আংলা।' এসবের

ভিতর ছিল তাঁর যে বিস্ময় বিমুগ্ধ কল্পনা, তারই মরমি দৃশ্যরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর ছবিতে। ১৯১১ সালে পুরী ভ্রমণের পর 'কোনারকের পথে' নামে যে ছবি এঁকেছিলেন বা ১৯১৯-২০-র দার্জিলিং-এর নিসর্গ, ১৯২৬-২৭-এর সাজাদপুরের দৃশ্যচিত্রমালা— এসব ছবির ভিতর আমরা দেখি, কেমন করে কবির কল্পনা আর শিল্পীর কল্পনা মিলেমিশে যায়। 'নব্য-ভারতীয় ঘরানা'-র আলোকিত কল্পনার সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে নন্দনাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাকে আকাশের উদাত্ততায় প্রসারিত করেন।

নব্য-ভারতীয় ঘরানার আধুনিকতা অতিক্রম করে আধুনিকতাবাদী বা মডার্নিজম-এর জটিলতায় গেছে আমাদের চিত্রকলা ১৯৪০-এর দশকে। কিন্তু ছবিতে আধুনিকতাবাদের প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য হন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনা ১৯২৩ সালের একেবারে শেষ পর্বে। তখন তাঁর বয়স ৬২ ছাড়িয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কবিতার কাটাকুটির ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছিল তাঁর ছবি। এইখানে আমরা দেখি তাঁর কবিতার যে কল্পনা আর ছবির পশ্চাৎপটের যে কল্পনা, তা সমান্তরাল নয়। সমধর্মীও নয়। বরং এই দুইয়ের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করে ছবির আদল তিনি অনেক সময়ই গড়েছেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। তবু ছবির দিকে তন্নিষ্ঠ যাত্রার সূচনা বলে ধরা হয় যে রচনাটিকে সেটি ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রক্তকরবী'-র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠায় কাটাকুটি করতে করতে গড়ে উঠেছিল। বিশু পাগলের গলার সেই গানটির প্রথম লাইন ছিল। 'আমার শেষ বাগিনীর প্রথম ধুয়ো/ধরলি রে কে তুই'। ছবি যেটা গড়ে উঠল তাতে একটা মানুষের শরীর যেন ক্রমান্বয়ে এক যন্ত্রণাক্ত পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। কবিতার কল্পনা থেকে ছবির কল্পনা এখানে একেবারেই আলাদা। এর পরে ১৯২৪ সালে কবি যখন 'পুরবী'-র পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করে গড়ে তুলেছিলেন ছবি, তখনও একই ঘটনা ঘটছিল। ছবি কবিতার ইলাস্ট্রেশন বা সচিত্রকরণ না হয়ে নতুন এক রূপ উদ্ভাসিত করছিল। এবার যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কবিতা ও ছবির জগতের দিকে তাকাই, তাহলে কল্পনার উন্মীলনের দুই ভিন্ন রূপ দেখতে পাই। ভিত্তিগতভাবে বা জীবনদর্শনের দিক থেকে তাতে একটা মিল অবশ্য আছে। শেষ পর্যায়ে পৌঁছে জগৎটাকে তিনি দেখছিলেন আকারের মহাযাত্রা হিসেবে। আর তাঁর চিরদিনের যে সংহতিপূর্ণ ঐশ্বরিকচেতনা, সে বিষয়েও একটা সংশয় জেগে উঠেছিল। গহন এক তমিস্রার রূপ জেগে উঠছিল চেতনায়। 'প্রান্তিক'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলেন : 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়/দেহ মোর জেগে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি/ নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা।' এই তমিস্রার রূপ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর শেষ পর্বের কবিতা ও ছবি। কিন্তু বিশ্বদৃষ্টির এই ঐক্যের ভিত্তি থেকে শুরু হলেও কবিতা ও ছবিতে কল্পনার বিস্তার ঘটে দুভাবে। কবিতায় বিষয় আসে আগে, তারপর আসে রূপ। ছবি আঁকার সময় আকার বা রূপের প্রক্রিয়া শুরু হয় আগে। তারপর সেই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে রূপ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতাতেও আধুনিকতাবাদের ইঙ্গিত কিছু কিছু আসছিল। অমঙ্গলচেতনা প্রাধান্য পাচ্ছিল। সংশয় জাগছিল ধ্রুবত্বের বোধ সম্পর্কে। কিন্তু আঙ্গিকের যে প্রথাবিরোধী নতুন দিগদর্শন আধুনিকতাবাদের মূল ভিত্তি, সেখানে বাংলা কবিতা পৌঁছাতে পেরেছিল জীবনানন্দে এসে। কবি জীবনানন্দ দাশকেই বলা যেতে পারে বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিকতাবাদী কবি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র (১৯৩৬) 'নির্জন সাক্ষর' কবিতায় তিনি যখন লেখেন 'যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত/লাগিতেছে আমার শরীরে' বা 'মহাপৃথিবী'-যে (১৯৪৪) বলেন 'সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ', তখন কল্পনার যে স্বকীয়তা ও অনন্যতা, তা বাংলা কবিতায় আগে কখনো আসে নি।

ভারতের চিত্রকলায় আধুনিকতাবাদ এসেছে রবীন্দ্রনাথের পরে ১৯৪০-র দশক ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাজের মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্বে দৃশ্যমান বাস্তবই ছিল কল্পনার ভিত্তি। জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের ছবিতে যেমন। তারপর সেই দৃশ্য-বাস্তবতা কল্পনায় ভেঙে ভেঙে কি দুর্মর বিমূর্ততার দিকে গেছে, তার পরিচয় ধরা থাকে সোমনাথ হোরের পরবর্তী পর্যায়ের ছবি ও ভাস্কর্যে। তারপর ১৯৬০-এর দশকে পৌঁছে রূপ ও কল্পরূপের সমন্বয়ে কল্পনা ক্রমশ গহন রহস্যকে উন্মীলিত করেছে, যেখানে সমগ্র মানবসভ্যতার প্রবহমান কল্পনা দেশ-কালের ভিত্তিতে সংহত হয়ে লৌকিক ও অলৌকিককে সমন্বিত করেছে।

কবি বা শিল্পীর সৃজন প্রক্রিয়ায় কল্পনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। চেতন মনের বা সচেতন ভাবনার সমস্ত বাঁধাধরা গণ্ডিকে অতিক্রম করে তা হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়। আপাত-বিচ্ছিন্ন বা আপাত-নিরর্থক কল্পনাও তখন অন্তর্নিহিত গভীরতর অর্থের দ্যোতনায় অর্থময় হয়ে উঠতে পারে। একজন কবি বা শিল্পী দীর্ঘ সাধনায় ব্যক্তিগত কল্পনাকে এভাবেই বিশ্বগত কল্পনার সাথে একাত্ম করে নিতে পারেন।

কল্পনার এই রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই তিনি যা বলেছেন, সৃজনের কল্পনা প্রসঙ্গে সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্ধৃত করা যেতে পারে সেই অংশটি।

> 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব-নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' (সমগ্র প্রবন্ধ, পৃ. ১৫)

কল্পনার এই বিশ্বগত বিস্তারই সৃজনের উৎসভূমি।

তবু এই কল্পনাকে ব্যবহার করার, এই কল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনেরও একটা পদ্ধতি আছে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-র একটি অংশে তারই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর সেই উক্তি দিয়েই এ আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে।

'স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে— কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না;

শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকর্মের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই— মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।' (রচনাবলী ১৮, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪০৮)

তথ্যসূত্র ও সহায়ক উৎস

১. অরিন্দম চক্রবর্তী। 'মননের মধু'। গাঙচিল। কলকাতা
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাহিত্য'। রচনাবলী, বিশ্বভারতী
৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চতুর্দশপদী কবিতা ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
৪. I. Frolov Ed. Dictionary of Philosophy. Progress Publishers. Mos cow. 1967/1984
৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।
৬. Jean. Paul Sartre 'The Psychology of Imagination.'
৭. Ernst Fischer 'Social History of Art'.
৮. S. B. ota. Bhimbetka (world Heritage series), Archaeo logical Survey of India, New Delhi 2008.
৯. ঋগ্বেদ সংহিতা। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা। ১৯৭৬।
১০. সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার। দ্বিতীয় খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন। ১৯৭৮।
১১. Leonardo da Vinci, Note-Book. noxford University Press. 1952/ 1986.
১২. A.C. Bradley 'Shakespearean Tragedy' Macmillan 1966.
১৩. Mark Roskill Ed. The Letters of Vincent Van Gogli. Fontana Paperbaens 1963/1982
১৪. শঙ্খ ঘোষ। কল্পনার হিস্টিরিয়া। প্রমা। কলকাতা। ১৯৮৪
১৫. Salvador Dali 'Diary of a Genius'. Picadoir. 1966
১৬. Micheal Roberts. Ed. The Faber Book of modern verese. Faber 1936.
১৭. বুদ্ধদেব বসু। শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা। প্রবন্ধ সংকলন। দে'জ। কলকাতা। ১৯৬৬/১৯৮২
১৮. জীবনানন্দ দাশ। কবিতার কথা। সমগ্র প্রবন্ধ। প্রতিক্ষণ। কলকাতা।
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জীবনস্মৃতি। রচনাবলী ১৮। বিশ্বভারতী।
২০. মৃণাল ঘোষ। বিশ্বশিল্পের রূপরেখা। অভিযান। কলকাতা। ২০১৬।
২১. মৃণাল ঘোষ। বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন। প্রতিক্ষণ। কলকাতা। ২০০৫